Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
ISSN 2583-6706 (Online)
Volume-3 Issue-1 July 2024

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষণের প্রাথমিক পর্ব

পিঙ্কি দাস মুখোপাধ্যায়

Link : 13. https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2024/07/13_pinky-mukhopadhyaay.pdf

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা পছন্দ করতেন না। তিনি ব্যক্তি-জীবনে তিনি বিদ্যালয়ের গণ্ডিবদ্ধ শিক্ষা মেনে নিতে পারেন নি। তাই বাল্যকালে একাধিকবার তাঁর বিদ্যালয় পরিবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু তার মানে এই নয়, তাঁর কাছে শিক্ষার গ্রহণ যোগ্যতা ছিল না। তিনি গণ্ডির শিক্ষা পছন্দ করতেন না। তাই বাল্যকালে তাঁদের বাড়িতে একাধিক মাস্টারমশাই নানা বিষয়ে পাঠ দিতেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা সংক্রান্ত নানা অভিমত দেখতে পাই। একদিকে তিনি যেমন মাতৃভাষার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ মান্যতা দিয়েছেন, তেমনি তিনি কখনো ইংরেজি শিক্ষাকে অবহেলা করেন নি। শিশুরা যাতে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি জোর দেন, তার জন্য তিনি নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজি কেবল লেখায় ভাষা না হয়ে থাকে, তার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি ইংরেজিতে কথোপকথনের জন্য গল্পের আসর বসাতেন। শিক্ষাদানের কৌশলকে জনপ্রিয় করে তুলতে শিশু পাঠ্য সুলভ মজার গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা সংক্রান্ত ভিন্ন অভিমুখগুলির গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশু পাঠ্য, বিদ্যালয়, ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজি ভাষা, মাতৃভাষা, শিক্ষণ প্রণালী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিক্ষণ চিন্তায় শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় পর্বের শুরু থেকেই অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন মাতৃভাষার উপর। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষাকেও অবহেলা করেন নি। মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য মাধ্যম করেছিলেন ইংরেজি সাহিত্যকে। সেক্ষেত্রে সবটাই শিক্ষার্থীদের বুঝতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধ্যকতা ছিল না, পড়ে যাওয়াটাই ছিল জরুরী। এ বিষয়ে তিনি জগদানন্দকে চিঠিতে লিখছেন (এপ্রিল ১৯১৩),

> **আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা বই পড়াবার দিকে একটু ঢিল দিয়েছি। আমরা একদিকে যেমন ইংরেজি সোপান, সংস্কৃত প্রবেশ প্রভৃতি অবলম্বন করে ধীরে ধীরে থাকে থাকে ভাষা শেখাবার চেষ্টা করি তেমনি সেই সঙ্গে উচিৎ অনেকগুলি ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থ একেবারে হুহু করে ছেলেদের পড়িয়ে যাওয়া। সেগুলো খুব বেশি তন্ন তন্ন করে পড়াবার একেবারেই দরকার নেই — তাড়াতাড়ি কোনো মতে কেবলমাত্র মানে করে আবৃত্তি করে পড়ে যাওয়া মাত্র। এরকম করে পড়ে গেলে সব যে ছেলেদের মনে থাকে তা নয় কিন্তু নিজের অলক্ষ্যে অগোচরে ভাষার পরিচয়টা মনের ভিতরে ভিতরে গড়ে উঠতে থাকে।**[১]

অর্থাৎ ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শ্রুতিচর্চা অত্যন্ত জরুরি। সাহিত্যগ্রন্থ পাঠ ভাষা শিখে নেওয়ার একটি মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। লাবণ্যলেখা চক্রবর্তীকে ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন (২০ অক্টোবর ১৯১০) — "খাপছাড়া করে পড়া নিতান্তই সময়ের অপব্যয় ভাষা শেখা অমন করে কখনোই হয় না।"[২] শ্রুতিচর্চার সঙ্গে গুরুত্ব দিয়েছিলেন ইন্দ্রিয়বোধচর্চা বা Sense training এবং ধারাবাহিক সময়ানুবর্তিতাকে। ভাষা শিক্ষা শুরু হওয়া উচিত শিশু বয়স থেকে কারণ, "শাঁচা বয়সেই ভাষাটা জীবনের সঙ্গে গভীর করে মেলে, আর ভাষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের যথার্থ প্রাণ প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হয়।"[৩] ব্যক্তিপ্রাণের সঙ্গে দেশের প্রাণ, বিশ্বপ্রাণের মেলবন্ধনেই শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষা ও ভাষার আভ্যন্তরীণ আনন্দ উপলব্ধি করবার পন্থা নির্দেশ করতে রবীন্দ্রনাথ

শিশুপাঠ্য উপযোগী গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীরা বড়ো হতে শুরু করে, তাদের জ্ঞান ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। তারা ভাষার রহস্য সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। এই চাহিদা কবি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে শিশুদের পরিচিতি ঘটাতে চেয়েছিলেন। নিজস্ব ভাষাসন্ধান, ভাষা সম্পর্কিত অনুভব ও উপলব্ধিকে প্রথাগত আকার দিতে রচনা করেছিলেন 'বাংলা ভাষা পরিচয়', 'শব্দতত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি। বাংলা ভাষার প্রাইমার হিসেবে লিখলেন 'সহজ পাঠ' (১৯৩০) প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ। ১৯০৯ সালে লিখেছিলেন 'শব্দতত্ত্ব' আর ১৯৩৫ সালে তার পরিবর্ধন করে লিখলেন 'বাংলা শব্দতত্ত্ব'। ছাত্রদের বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণ প্রণালীর ক্রমবিকাশও লক্ষণীয়।

ভাষা শিক্ষণ প্রণালীতে তিনি শিক্ষকদেরও গুরুত্বের কথা বলেছেন। তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ ও সহযোগিতা আদায় করেছেন এবং নিজে তাঁদের সহযোগিতা করেছেন। ছাত্রদের যথাযথভাবে ভাষা শেখানোর জন্য শিক্ষকদের সেই ভাষা, ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান ও সঠিক উচ্চারণের মাধ্যমে পাঠ প্রণালীকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। কেবল বাংলা, ইংরাজি নয় — অন্যান্য ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর এই মত সমানভাবে প্রযোজ্য। জগদানন্দ রায়কে জানিয়েছিলেন — "তোমাদের সংস্কৃত ও ইংরেজি অধ্যাপনার মধ্যে এখন থেকে সাহিত্যগ্রন্থ পাঠকে খুব বড় স্থান দিতে হবে — বছরের মধ্যে অন্তত দুখানা করে বই পড়ে শেষ করা চাই।"[৪]

সেইসঙ্গে জানিয়েছেন যে আমরা প্রতিদিন পদে পদে পরীক্ষার ফল দেখে তবেই আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর সফলতার বিচার করি। এইরকম সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার করতে করতেই রবীন্দ্র-শিক্ষণ প্রণালী বিস্তার লাভ করেছে। ইংরেজি ভাষা শেখানোর জন্য তিনি এমন শিক্ষকের সন্ধান করেছেন যিনি কেবল ইংরেজি ভাষা নয়, ইংরেজি সাহিত্যেও দক্ষ। যাঁর কল্পনা আছে, সাহিত্যের রসগ্রহণ ও ছাত্রদের মনে তা সঞ্চার করে দিতে পারবেন। তিনি নিজে যখন বিদ্যালয়ে ছেলেদের ইংরেজি পড়াতেন তখন তাদের মাতৃভাষা বাংলা অনুসারেই পড়াতেন। তাঁর শিক্ষণ ব্যবস্থায় ছাত্র-অধ্যাপক সমানভাবে অংশগ্রহণ করতো। ছেলেদের দিয়েই পড়ানোর কাজটা করিয়ে নিতেন। বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ তিনি ছেলেদের দিয়েই বার করে আনতেন। ১৯২৯ সালের ১০ মার্চ অনাথনাথ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে কবি জানাচ্ছেন —

> **বাংলা শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনকে জাগাবার রাস্তা যত প্রশস্ত এমন আর কোন উপায়ে নয়।... ভাষার বাহ্যরূপটাও ওদের বেশ ভালো করে জানা উচিৎ যাতে ওরা ভাষাটাকে যথোচিতভাবে ব্যবহার করতে পারে। ইংরেজি বই থেকে মনের খোরাক পাবার অবস্থায় পৌঁছতে দেরি হবে — কিন্তু বাংলা থেকে প্রতিদিন যেন ওদের মন খাদ্য পায়।**

বাংলা মাধ্যমে ইংরেজি পড়ানোর পাশাপাশি তিনি মনে করতেন 'লিখিত' কথার চেয়ে শিক্ষকের মুখের কথার প্রভাব বেশি। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে প্রতিদিন যেন একবার মধ্যাহ্নে বা সায়াহ্নে গল্পে বসার আগে ছেলেদের ইংরেজি কথোপকথন চর্চার অভ্যাস করানো হয়। এছাড়া তাঁকে কবি Stories from Chaucer এবং Stories from Greek History বই দুটি পাঠিয়েছিলেন যাতে গল্প কথকরা ছেলেদের শোনায়। তিনি চেয়েছিলেন মূলত বড়ো ছেলেরা ছোটো ছেলেদের সেই গল্প শোনায়। তিনি নিজে ক্লাসে ছোটো ছেলেদের টেনিসনের কবিতা পড়ে শোনাতেন। এরই মধ্য দিয়ে ছাত্ররা অনেক কিছু শিতে নিতে পারতো। কথোপকথন পাঠ প্রণালীতে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই সমান দায়িত্ব। তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষণপ্রণালী কেবল ছাত্র উপযোগী নয়, শিক্ষক উপযোগীও ছিল।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষার শিক্ষার জন্য কবি নিজস্ব প্রণালী উদ্ভব করেছিলেন। সেই প্রণালীর খসড়া রচনা করে তা তুলে দেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। প্রণালী অনুসরণ করে সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক তৈরির দায়িত্বও পেয়েছিলেন হরিচরণ। হরিচরণের স্মৃতিকথা (রবীন্দ্রনাথের কথা) থেকে জানা যায় —

"যখন এলাম তখন আশ্রমের ছাত্রসংখ্যা বোধ হয় চোদ্দ পনেরো। সে সময় সংস্কৃতের পাঠ্যপুস্তক ছিল না, কয়েক পৃষ্ঠা সংস্কৃত-পাঠের পাণ্ডুলিপি গুরুদেব আমাদের দিয়ে বলেছিলেন, এটা দেখে এখন পড়াও, আর সেই পদ্ধতি অনুসারে একটা সংস্কৃত পাঠ্য লিখতে আরম্ভ কর। সেই পাণ্ডুলিপির প্রণালী অনুসারে আমি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ [?] সংস্কৃত প্রবেশ লিখেছিলাম।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা প্রণালীর সাফল্য সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র বসুকে একটি চিঠিতে জানালেন (১৭ সেপ্টেম্বর

১৯০০),

"আপনার শ্যালকজায়া আর্যা সরলা বিদ্যার্ণবের কাছে সম্প্রতি সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেছেন। শিক্ষাপ্রণালীটি আমার রচিত। খুব দ্রুত উন্নতিলাভ করেছেন — পণ্ডিতমশায় এমন বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়ে ভারী খুশিতে আছেন। আমি তাঁকে পূর্বেই আশ্বাস দিয়েছি আমার পদ্ধতির মতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তা হলে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মাবে। তাঁর সংস্কৃতচর্চায় আমি ভারী আশান্বিত হয়েছি। আমাদের বর্তমান শিক্ষিত মেয়েদের অতিমাত্রায় ইংরেজি চর্চার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সংস্কৃত শেখাটা একান্ত দরকার আছে।"[৬]

'সংস্কৃত প্রবেশ' প্রথম খণ্ডের প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকীয়তে ভাষা শিক্ষা প্রসঙ্গো আরও বিস্তৃতভাবে জানালেন —

"ভাষার সহিত কিছুমাত্র পরিচয় হইবার পূর্বেই শিশুদিগকে তাহার ব্যাকরণ শিখাইতে আরম্ভ করো, ভাষাশিক্ষার সদুপায় বলিয়া আমি গণ্য করি না।

"এই জন্য আমার গৃহে বালকবালিকাদিগকে যখন সংস্কৃত শিখাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন আর কোনো সুবিধা না দেখিয়া নিজে একটা সংস্কৃত-পাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

"কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আমার যে স্বল্পমাত্র আধিক্য আছে, তাহাতে আমার দ্বারা কিছুদূর পর্যন্ত প্রণালী নির্দেশ করিয়া দেওয়াই শোভা পায় — সঙ্কটের আশঙ্কা করিয়া তাহার অধিক অগ্রসর হইতে পারি নাই। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হইলে পর, সেখানকার ছাত্রদের যখন সংস্কৃত শিক্ষার সুপ্রণালী অনুসরণ করা আবশ্যক বোধ করিলাম, তখন আদর্শস্বরূপ সংস্কৃতপ্রবেশ প্রথম কিয়দংশ লিখিয়া, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে উহা শেষ করিবার জন্য সমর্পণ করিয়া দিলাম।"

হরিচরণের 'সংস্কৃত প্রবেশ' সম্পর্কে কবি বিশেষভাবে উৎসুক ছিলেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি জানিয়েছিলেন (২৭ অক্টোবর ১৯০২), "হরিচরণ যে সংস্কৃত পাঠ লিখিতেছিলেন সেটা বোধহয় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।"[৭] হরিচরণ রচনা করেছিলেন 'সংস্কৃত প্রবেশ' আর রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন দুই খণ্ডের 'সংস্কৃত শিক্ষা'। নিয়মিত চর্চা ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত শিক্ষাকে আরও দৃঢ় করবার জন্য বিদ্যালয়ের সময়সূচিতে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলার নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছিলেন।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কবি মাতৃভাষাকে প্রধান বাহন হিসেবে ব্যবহারের কথা বলেছিলেন। ১৯২৩ সালে কাশী বঙ্গাসাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির ভাষণে কবি বলেছিলেন, মাতৃভাষা যখন ব্যক্তির নিজস্ব মনোভাবে প্রকৃষ্ট বাহন হয়, তখনই অন্য ভাষার মর্মগত ভাবের সঙ্গো ব্যক্তির সত্যিকারের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিশু বয়স থেকে ইংরেজি শিক্ষার কথা বললেও ইংরেজি মাধ্যমের কথা বলেননি। মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার উপরেই জোর দিয়েছেন। ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের দশ বছর আগে তিনি শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধে বাংলা ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার কথা বলেছিলেন এবং ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষণ প্রণালীতে তা চালু করার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করেছিলেন। এখানে ইতিহাস, ভূগোল এমনকি বিজ্ঞানের বিষয়গুলিও বাংলা ভাষায় পড়ানো হতো। ১৯১০ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা আবশ্যিক পাঠ্য ও পরীক্ষার বিষয় হিসেবে নির্ধারিত হয়। এর আগে মেয়েরা তার জন্য বিশেষ অনুমতি পেলেও ছেলেদের অনুমতি দেওয়া হতো না। মাতৃভাষা সম্পর্কে জগদানন্দকে জানিয়েছিলেন (এপ্রিল ১৯১৩) —

> **ছেলেরা মাতৃভাষা একটু একটু করে বাঁধ বেঁধে বেঁধে পাকা করে শেখে না — তারা যা জেনেছে এবং যা জানে না সমস্তই তাদের মনের উপরে অবিশ্রাম বর্ষণ হতে থাকে — হতে হতে কখন যে তাদের শিক্ষা সম্পন্ন হয়ে ওঠে তা টেরই পাওয়া যায় না। প্রকৃতির প্রণালীর গুণ হচ্চে এই যে প্রকৃতি তার শিক্ষাকে কিছুতেই বিরক্তিকর করে তোলে না।**[৮]

ছেলেরা ছোটো বয়স থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাতৃভাষা শেখে। তাই সেই ভাষাতে তাদের যে-কোনো বিষয় সম্পর্কে জানালে অতি সহজেই বোধগম্য হয়। এই শিক্ষা যেহেতু চাপিয়ে দেওয়া নয়, তাই তা আনন্দ দান করতে পারে। তিনি লক্ষ করেছিলেন আমাদের দেশে মাতৃভাষাকে যথার্থভাবে শিক্ষার বাহন করা যায়নি। বরং তার জায়গায় স্থান পেয়েছে ইংরেজি শিক্ষা। মাধ্যমের এই ভেদাভেদ শিক্ষাক্ষেত্রে বিরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ কখনোই ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না,

ইংরেজি শিক্ষার সম্মান বজায় রেখেই মাতৃভাষাকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। নানা সময় নানা দেশ ভ্রমণকারে সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষণপ্রণালী বিষয়ে তিনি তথ্য অনুসন্ধান করেছেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার অবস্থা দেখে দুঃখবোধ করেছেন। ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন। সেখানে জানিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে বিচ্ছেদ নেই। ব্রহ্মবিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, পরে শ্রীনিকেতন এবং শিক্ষাসত্রে কবি শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসেবে স্বীকৃতি এবং বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সেই শিক্ষাকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের সাধনা। আর 'সাধনা' পত্রিকা হয়ে উঠেছিল তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত নানা ভাবনাচিন্তার প্রকাশস্থল। এখানে প্রকাশিত হয় 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ', 'শিক্ষার হেরফের', 'প্রসঙ্গকথা'সহ বিভিন্ন শিক্ষাসংক্রান্ত প্রবন্ধ। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা প্রণালী, শিক্ষা ব্যবস্থা, পরীক্ষা পদ্ধতি কবি বর্জন করলেও ইংরেজি শিক্ষার ব্যবহারিক দিক দিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 'সাধনা'য় লিখছেন —

"বাল্যকাল হইতেই ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক, কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিকরূপে অতি অল্পে অল্পে; তাহা হইলে বাংলা শিক্ষা ইংরেজী শিক্ষার সাহায্য করিবে। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরেজিকে কেবল ভাষাশিক্ষারূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরেজি শিখিবার সময় অধিক পাওয়া যায়।... তবে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা যে কত সহজসাধ্য হইত, তাহা বলা যায় না।"[৯] হেমন্তবালা দেবীকে জানাচ্ছেন (৫ ডিসেম্বর ১৯৩২) — "বই পড়ার রাস্তায় ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমাদের যোগসাধনটাই প্রশস্ত। সে কম লাভ নয়।"[১০] সরাসরি ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া পদ্ধতি বা ডাইরেক্ট ইংরেজি টিচিং পদ্ধতিতে তিনি আমাদের দেশে একজন পথিকৃৎ স্বরূপ। ১৯০৪এ তিনি ইংরেজি শিক্ষার জন্য রচনা করলেন 'ইংরেজি সোপান'। প্রথমে ঠিক হয়েছিল গ্রন্থটি লিখবেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের কার্তিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন, "আপনার Reader অগ্রসর হইয়াছে শুনিয়া বড়ই খুসি হইলাম। কপি করিয়া আমাকে পাঠাইলে আমার মন্তব্য জানাইতে চেষ্টা করিব।"[১১] কিন্তু মনোরঞ্জনের দ্বারা কাজের অগ্রসর না হওয়ার ফলে গ্রন্থটির দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ নিজেই গ্রহণ করেন। ১৩১০ বঙ্গাব্দের পৌষে সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লেখা চিঠিতে তিনি লিখছেন, "কই — সেই ইংরাজী রীডার কপি করিয়া পাঠাইলে না? আমি ত কাল [শিলাইদহ] যাত্রা করিতেছি। ইতিমধ্যে পাঠাইলে ছাপার বন্দোবস্ত করিতে পারিতাম। মোহিতবাবুকে বলিয়া গেলাম — তাঁহাকে পাঠাইলে তিনি প্রেসে দিয়া দেখিয়া শুনিয়া ছাপাইবেন। বিলম্ব করিয়ো না।"[১২]

গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় মোহিতচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে। প্রকাশিত হয় কবির চুয়াল্লিশতম জন্মদিনে, ৭ মে ১৯০৪ (২৫ বৈশাখ)। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৫ জুন ১৯০৬। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত। গ্রন্থের উপক্রমণিকার অংশ নিয়েই পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যা ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ শিক্ষকদের জন্য, তাই ভূমিকার নামকরণ করেছেন 'শিক্ষকদের প্রতি নিবেদন'। ১০ মে মোহিতচন্দ্র সেনকে চিঠিতে ইংরেজি সোপান সম্পর্কে বিশদ জানিয়ে কিছু সংশোধন ও পরিমার্জনের কথা বলছেন —

"ইংরাজি সোপানের কাপি পাঠাচ্ছি। একবার করে revise নেবেন। অনেক জায়গায় যথেষ্ট উদারহণ দেওয়া হয়নি সেগুলি পূরণ করবেন — Adverbs গুলি ঠিক খাপ খায় কিনা দেখে নেবেন। কারণ, প্রথম লেখার পর sentence গুলি স্থানে স্থানে বদল ও কমিবেশি হয়ে গেছে — adverb গুলির সেই অনুসারে পরিবর্ত্তন হয়নি। পাণ্ডুলিপির যে যে অংশে মার্জ্জিনে এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে সেগুলিকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করে নেবেন। ইংরাজি সোপান প্রথম ভাগে subject predicate সম্বন্ধে শিক্ষকদের প্রতি যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে আমার বোধ হচ্চে শিশু পাঠকদের পক্ষে সেটা ঠিক উপযোগী হয় নি — ওটা শমীর মত ছেলেকে বোঝানো শক্ত। ইংরাজি সোপান ১ম ভাগ খুব ছোট ছেলেদের জন্যেই ত।"[১৩]

ছাত্রদের বয়সের কথা, বয়সোচিত সীমাবদ্ধতার কথাও তাঁর মাথায় ছিল। গ্রন্থটি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করলেও তা সাফল্যলাভ করেছিল। সেই সাফল্যে ভর করেই কবি বইটি প্রকাশে উদ্যোগী হন। ইংরাজি শিক্ষানবীশ এবং বয়স্ক শিক্ষার পক্ষেও যে এই গ্রন্থটি সহায়ক হবে এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তিনি লিখেছেন —

> **ইংরাজি সোপান বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য রচিত হয়েছিল।... কয়েক বৎসর বোলপুর বিদ্যালয়ে এই প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া যেরূপ ফললাভ করা গিয়াছে তাহাতে অসংকোচে এই গ্রন্থ সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি। যাঁহারা অধিক বয়সে ইংরাজি শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হইয়াছে বলিয়া আমাদের**

বিশ্বাস।[১৪]

১৯০৯ সালে 'ইংরেজি সোপান'এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডটি রচনায় কবির প্রধান সহায়ক ছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। দ্বিতীয় খণ্ড রচনাকালে অজিতকুমারকে কবি চিঠিতে লিখেছেন — "ছেলে পড়ানোর কাজে উঠে পড়ে লেগেছি, আর একটা কারণ, তার উপর আমাকে ইংরেজি পড়াবার Text Book লিখতে হচ্চে।"[১৫] ইংরেজি শিক্ষার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের সুবিধার্থে চারটি বই রচনা করেছিলেন — 'ইংরাজি সোপান', 'ইংরাজি পাঠ', 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা', 'ইংরেজি সহজশিক্ষা' আর একটি বই অনুবাদচর্চা।

কবি শুধুমাত্র বাংলা, ইংরেজি বা সংস্কৃত ভাষার উপরই জোর দেন নি, অন্যান্য ভাষা বিষয়েও বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখছেন — "আমাদের এখানে হিন্দিভাষী ছেলেমেয়েরা হিন্দি শিক্ষার সুযোগ পায় কিন্তু নিয়ম করেছি তাদের পরীক্ষা দিতে হবে বাংলা ভাষায়। তাতে ওদের হিন্দি শিক্ষায় শৈথিল্য হচ্চে না অথচ তাঁরা বাংলা শিক্ষাকে উপেক্ষা করতে পারে না।" ১৬ লক্ষ করবার বিষয় সময়টা ১৯৩৯ ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিশ্বভারতীর রূপলাভ করেছে। এখানে কবি যে হিন্দিভাষী ছেলেমেয়েদের কথা বলেছেন তারা বিশ্বভারতীর উচ্চস্তরের ছাত্র-ছাত্রী।

ভারতীয় বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষার প্রত্যক্ষ রীতি কবির ব্রহ্মবিদ্যালয়েই প্রথম চালু হয়। ব্রহ্মবিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে পরিণতি লাভ করার পর শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন ভাষার বিভাগ খোলা হয় এবং দেশ বিদেশ থেকে অভিজ্ঞ, পণ্ডিত ব্যক্তিরা ভাষাশিক্ষাদানে যুক্ত হয়েছেন। পরবর্তীকালে কবির পথ ধরে বিশ্বভারতীতে ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগ স্থাপন, বিভিন্ন ভাষার শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আলাদা করে একটি ভাষাভবন তৈরি হয়েছে। কবির পথ ধরে বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য আজও বহমান।

তথ্যসূত্র:

১। 'জগদানন্দ রায়কে লেখা চিঠি, শান্তিনিকেতন ও ব্রহ্মবিদ্যালয়: জগদানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ', সুবিমল মিশ্র সম্পাদিত, কলকাতা, জানুআরি ২০১৪, পৃ. ৪৪ (অতঃপর 'শান্তিনিকেতন ও ব্রহ্মবিদ্যালয়: জগদানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ' নামে উল্লিখিত)

২। 'ভক্ত ও কবি: অজিতকুমার চক্রবর্তী-রবীন্দ্রনাথ পত্র বিনিময়', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা জানুআরি ২০০৭, পৃ. ২২৩

৩। 'নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি', ১৯২৪

৪। 'শান্তিনিকেতন ও ব্রহ্মবিদ্যালয়: জগদানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ৪৬

৫। 'চিঠিপত্র', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, মার্চ ১৯৯২, খণ্ড ১৩, পৃ. ২২৯ (অতঃপর 'চিঠিপত্র ১৩' নামে উল্লিখিত)

৬। 'চিঠিপত্র', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৫, খণ্ড ৬, পৃ. ১০-১১

৭। 'চিঠিপত্র ১৩', পৃ. ৮

৮। 'শান্তিনিকেতন ও ব্রহ্মবিদ্যালয়: জগদানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ৪৫

৯। 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা', প্রবোধচন্দ্র সেন, সাধনা ১২৯৯, পৃ. ৯-১০

১০। 'চিঠিপত্র', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, মাঘ ১৪১৮, খণ্ড ৯, পৃ. ১৯৫

১১। 'রবিজীবনী', প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা অগস্ট ২০০২, খণ্ড ৫, পৃ. ১৮১

১২। ওই, পৃ. ১৮১

১৩। বিশ্বভারতী পত্রিকা, চৈত্র ১৩৩৯, পৃ. ৫৬৬

১৪। 'সকল শিক্ষা দিলেম ফাঁকি', পিনাকী ভাদুড়ী, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪০৮, পৃ. ৭৫

১৫। 'রবীন্দ্রপত্রাভিধান ২২১', বিজয় ঘোষাল, জুলাই ১৯১৮, পত্রলেখা, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৩, পৃ. ১৯৮

১৬। 'চিঠিপত্র', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৯৯৩, খণ্ড ১২, পৃ. ২০০-২০১

লেখক পরিচিতি: পিঙ্কি দাস মুখোপাধ্যায়, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হীরালাল ভকত কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ